রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও দেশবাসীর প্রত্যাশা

ইমদাদ ইসলাম

আধুনিক মানব সভ্যতা যে ভিত্তিগুলির ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বিদ্যুৎকে ব্যবহার করে যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলির সাক্ষী ছিলো গত শতাব্দী। মানুষের জীবন সহজ এবং সাচ্ছন্দ্যময় করে তুলতে বিদ্যুতের অবদান সবচেয়ে বেশি। বিদ্যুৎ আমাদের এ পৃথিবীকে গতিময়,অদম্য ও অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে। বর্তমান যুগে দৈনন্দিন জীবনে প্রতি মূহুর্তে মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন বিদ্যুতের। যতদূর জানা যায় আমাদের এ দেশে প্রথম বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে ওঠে ঢাকার আহসান মঞ্জিলে ১৯০১ সালে। সেই থেকে শুরু, কালের প্ররিক্রমায় আজ দেশের শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে।

সরকার ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ- মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ - আয়ের দেশে উত্তরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য বিপুল পরিমাণ আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণ করা হয়েছে। এ সব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। বিগত ১৪ বছর ধরে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে দেশে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এখন কম বেশি ২৬ হাজার ৭শরও বেশি (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। এ সময়ে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২০ কিলোওয়াট আওয়ার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬০৯ কিলোওয়াট আওয়ারেরও বেশি উন্নীত হয়েছে। এ সময়কালে ৫ হাজার ২শরও বেশি সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন এবং ৩ লাখ ৩৬ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। বিদুৎ বিতরণের সিস্টেম লস ১৪.৩৩ শতাংশ (২০০৮-২০০৯) থেকে ৭.৭৪ শতাংশে (২০২১-২২) নামিয়ে আনা হয়েছে। ২০০৯ সালে দেশে বিদুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ছিলো ২৭ টি,মোট বিদুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিলো ৪ হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট। আর ২০২২ সালে দেশের মোট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫৪ টি,মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা কম বেশি ২৭ হাজার মেগাওয়াট। বিদ্যুতের একটি বড়ো সমস্যা হলো একটি বিদুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে অনেক সময় লাগে। বড়ো বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে অনেক সময় ৫ থেকে ১০ বছরও লেগে যায়। এ জন্য অনেক অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। বিদুৎ উৎপাদন করে সাথে সাথে ব্যবহার করতে হয়,স্টক করে রাখার সুযোগ নেই।

বিদুৎ শক্তির মূল উৎস হলো পানি, বায়ু, প্রাকৃতিক গ্যাস,কয়লা,খনিজ তেল ও সৌরশক্তি। প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে সারা পৃথিবীতে এখন নানারকম পাওয়ার প্লান্ট দেখা যায়। এগুলো এক একটি একেক রকম প্রযুক্তি নির্ভর। বাংলাদেশে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের শতকরা ৪৪ শতাংশ করে সরকারি ও বেসরকারি মালিকানাধীন, ৬ শতাংশ যৌথ উদ্যোগে এবং ৫ শতাংশ বিদ্যুৎ আমদানি নির্ভর। এ সব বিদ্যুতের শতকরা ৫১.৩৫ শতাংশ গ্যাস,২৭.৪৬ শতাংশ ফার্নেস অয়েল, ৮.০১ শতাংশ কয়লা,৫.৮৫ শতাংশ ডিজেল, ১.০৪ শতাংশ জল বিদ্যুৎ এবং ১.০৪ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুবিধা অসুবিধা দুটোই আছে। ২০২১ সাল পর্যন্ত সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১১৯ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের সল্পতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সরকার ' পাওয়ার সেক্টর মাষ্টার প্ল্যান,২০১৬ প্রস্তুত করেছে। এই মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহের সীমাবদ্ধতা বিবেচনাসহ জ্বালানি নিরাপত্তা ও জ্বালানি বহুমুখীকরণের জন্য গ্যাস,তরল জ্বালানি, কয়লা পারমাণবিক, হাইড্রো,নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে আমদানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বেজ লোড বিদ্যুৎ উৎপাদন হিসেবে কয়লা ব্যবহার করা হবে।

সরকার দক্ষিণ অঞ্চলের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাগেরহাটের রামপালে সুন্দরবন থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে পশুর নদীর পূর্ব তীর ঘেঁষে ৯১৫ একর জমির ওপর বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (BIFPCL) নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০১০ সালে জমি অধিগ্রহণ করে বালু ভরাটের মাধ্যমে প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার রাজনগর ও গৌরঙ্গা ইউনিয়নের সাপমারী ও কৈন্দাদ্দশকাঠী মৌজায় এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৭ সালের ২৪ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এখানে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে দুইটি ইউনিট আছে। প্রতিটি ইউনিট ৬৬০ মেগাওয়াট করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম। অর্থাৎ ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র। বাংলাদেশ - ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি এই প্রজেক্টটি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ১ হাজার ৬ শত কোটি টাকা (৩০ শতাংশ শেয়ার) এবং এনটিপিসি লি: ভারত সমপরিমাণ ১ হাজার ৬ শত কোটি টাকা(৩০ শতাংশ শেয়ার) বিনিয়োগ করেছে। অবশিষ্ট ১.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ যোগান দিয়েছে ECA । বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সাথে ২৫ বছর মেয়াদি বিদ্যুৎ চুক্তি হয়েছে এনটিসিপি লি: ভারতের। এ প্রকল্পে ৯১৫ একর জমির মধ্যে ৪৬৫ একর জমিতে মূল বিদুৎ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে এবং বাকি জায়গায় সোলার প্যানেল ও সবুজায়ন করা হচ্ছে। বিশ্বের ১৩ তম দেশ হিসেবে আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল পদ্ধতিতে কয়লা ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। সার্বক্ষণিক পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালুসহ প্রকল্প

এলাকায় দুই লাখ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে সবুজ বনায়ন করা হচ্ছে, যা অনেকটাই এখন দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে।

এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত আমদানিকৃত কয়লা বিশেষ ধরনের ঢাকনা যুক্ত জাহাজে প্রথমে মোংলা বন্দরে আনা হচ্ছে। সেখান থেকে বিশেষ ধরনের ঢাকনাযুক্ত লাইটার জাহাজে করে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিজস্ব জেটিতে আনা হয়। এরপর কয়লাগুলো একটি সেডের নীচে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মজুদ করা হয়। কোনো পর্যায়েই কয়লাগুলো খোলা আকাশের নীচে থাকে না। এরপর কয়লাগুলো ক্রাশ মেশিনের মধ্যে পাঠিয়ে পাউডারে পরিণত করা হয়। এটা করা হয় যাতে কয়লাগুলো সম্পূর্ণভাবে জ্বলে যেতে পারে এবং কয়লাও নষ্ট কম হয়। তাছাড়া এতে ছাইও খুব কম হয়। এরপর এই কয়লার ডাস্ট চলে যায় বয়লার মেশিনে যেখানে সব সময় আগুন জ্বলে। এরমধ্যে উপরে পাইপে পানি থাকে এই আগুনের তাপে উপরের পানি গরম হয়ে বাষ্পে পরিণত হয়। আর এই বাষ্প থেকে তৈরি হয় বিদ্যুৎ। একটা সাধারণ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা পোড়ানো দক্ষতা শতকরা ২৮ শতাংশ। সেখানে আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্ল্যান্টের দক্ষতা ৪২ থেকে ৪৩ শতাংশ। অর্থাৎ একই পরিমাণ কয়লা পুড়িয়ে দেড়গুণ বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। এ দিকে যখন কয়লা পুড়ে তখন দুই ধরনের ছাই উৎপন্ন হয়। এক ধরনের ছাই ভারি হওয়ার কারণে টাওয়ারের নীচে জমা হয়। তাকে বটম অ্যাশ বলে। এগুলো সিমেন্ট তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। আর এক ধরনের ছাই খুব হালকা হওয়ার কারণে সেটা বয়লারের লম্বা সরু চিমনির মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। এটাকে বলা হয় ফ্লাই অ্যাশ। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে Electro-static Precipitator ব্যবহার করা হয়েছে ফলে উদগীরণকৃত ফ্লাই অ্যাসের ৯৯.৯৯ শতাংশ ধরে রাখতে সক্ষম। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিমনির উচ্চতা ২৭৫ মিটার যা অন্যান্য যে কোনো পাওয়ার প্ল্যান্টের চিমনির উচ্চতা থেকে অনেক বেশি। এখান থেকে সামান্য পরিমাণ ফ্লাই অ্যাস উদগীরণ হয়। প্রাকৃতিক বায়ু প্রবাহের কারণে যা সুন্দরবন অংশে যাবে না। আবার চিমনির উচ্চতা বেশি হওয়ার কারণে এটি সহনীয় মাত্রায় থাকে। Flue gas desulphurization স্থাপনের ফলে এখানে ৯৬ শতাংশ সালফার গ্যাস শোষিত হয়। এই গ্যাস দিয়ে জিপসাম সার তৈরি করা হয়। শব্দ ও আলো দূষণের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এখানে কম শব্দযুক্ত ইঞ্জিনসম্পন্ন কার্গো ব্যবহার করা হচ্ছে। যার শব্দ সর্বোচ্চ ২ শত মিটারের মধ্যে থাকবে। এছাড়াও পশুর নদীর লবণ পানি শোধন করে এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যবহৃত পানি শীতল করে পুনরায় ব্যবহার করা হচ্ছে। কোনো দূষিত পানি নদীতে ফেলা হচ্ছে না। ব্যবহৃরিত পানির পরিমাণও খুব কম। শুষ্ক মৌসুমে পরশু নদীর পানি প্রবাহের ০.০৫ শতাংশ। এ প্রকল্পে পরামর্শক হিসেবে জার্মানীর ফিশনার (Fichtner) গ্রুপ কাজ করছে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য কয়লা আমদানি করা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে।

গত বছর ১৫ আগস্ট (২০২২ সাল) বিদ্যুৎ কেন্দ্রেটির প্রথম ইউনিট পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আনুষ্ঠানিকভাবে গত ৬ ডিসেম্বর ২০২২ ভার্চুয়ালি রামপাল মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট উদ্বোধন করেন। ১৯ ডিসেম্বর থেকে এ পাওয়ার প্ল্যান্টের ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়। এ বিদ্যুৎ খুলনা ও ঢাকা বিভাগে ব্যবহার করা হচ্ছে। দ্বিতীয় ইউনিটের কাজে দ্রুত এগিয়ে চলছে। আগামী জুন - জুলাই নাগাদ পরীক্ষামূলক উৎপাদনে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ চলছে। পুরো প্রকল্পের কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৮৩ শতাংশেরও বেশি। এখানে উল্লেখ্য এই প্রকল্পের বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারিত হবে আমদানিকৃত কয়লার মূল্যের ওপর ভিত্তি করে।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিদ্যুতের চাহিদা। দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বিদ্যুৎ। বাগেরহাটের রামপালে অবস্থিত বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র দেশের মানুষের সেই চাহিদা পূরণে অবদান রাখছে। আর্থসামাজিক খাতে বাংলাদেশের বিস্ময়কর উত্থান ও অগ্রযাত্রা এখন সারাবিশ্বে স্বীকৃত। এ ধারাকে আরও গতিময় করে ২০৩০ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ এ উন্নত বাংলাদেশ নির্মাণই এখন দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা।

#

পিআইডি ফিচার